Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 211-228

ছিটমহল এবং বর্তমান সময় : রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে

বিমল সরকার

গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হলে উভয় দেশের নাগরিকরা স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করতে থাকে আর ঠিক এই সময়ে ছিটমহলের মানুষ ঠিক তার বিপরীতে নাগরিকত্ব হারিয়ে ফেলে। ফলে উভয় দেশের নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় সমস্ত অধিকার ভোগ করা শুরু করে, কিন্তু ছিটমহলের মানুষজন সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। দেশভাগের শুরু থেকে অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৬৮ বছর ছিটমহলে বসবাসকারী শত শত নারী পুরুষ না পেয়েছে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার, না পেয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার। ছিটমহলগুলোতে ক্রমাগত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বার বার এবং নাগরিকত্বহীন মানুষদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম ছিল হৃদয়বিদারক। তাদের না ছিল খাদ্যের নিরাপত্তা, না ছিল স্বাস্থ্যসেবা, না ছিল শিক্ষার সুযোগ। এক কথায় শুধুমাত্র মৌলিক চাহিদা পূরণের সংগ্রামে ছিটমহলের মানুষের অবস্থা ছিল মানবাধিকারের পরিপন্থী। এই অধ্যায়টিতে বিলুপ্ত ছিটমহলের আর্থসামাজিক অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য প্রথমে ছিটমহল বিনিময়কালীন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং দ্বিতীয় ভাগে বিনিময়ের পরবর্তী সময়ে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হবে।

ছিটমহলবাসীর অর্থনৈতিক অবরুদ্ধতা :

ছিটমহলের মানুষের জমিজমা বসতবাড়ি ও কর্মসংস্থানের মত বিষয়গুলো মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিছুটা পরে ভারতে কিছুটা পাকিস্তানে আর কিছুটা ছিটমহলে। তাই ছিটমহলের অভ্যন্তরে তাদের যেটুকু জমিজামা বেঁচে ছিল তার ওপর নির্ভর করে শুরু হয় তাদের জীবন জীবিকা। দেশভাগের পরে অমীমাংসিত ছিটমহলগুলির কথা মাথায় না রেখে ভারত এবং পাকিস্তান এক নির্মম জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল যার প্রভাব ছিটমহলের জনজীবনের উপর ব্যাপকভাবে পড়েছিল। যার অনেক প্রমান বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল পত্রে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী উভয় দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল প্রায় নিত্যনৈতিক ঘটনা। আর এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ছিটমহলের মানুষ এক বন্দীদশায় জীবন যাপন করত কারণ সে সময় তাদের হাটে বাজারে কেনা-বেচা করতে যেতে বাধা দেওয়া হত। অপরপক্ষে তারা সীমানা অতিক্রম করে মূল ভূখণ্ডেও

যেতে পারত না তার কারণ সীমান্তের চরম উত্তেজনা। ফলে এক কথায় ছিটমহলে মানুষ সে সময় এক অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে পড়ে। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৫০ সালের ২৯ ও ৩০ শে আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত পাকিস্তান মুখ্য সচিব পর্যায়ের সম্মেলনে ছিটমহলগুলোতে মূল ভূখণ্ড থেকে মাসে একবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাঠানোর ব্যাপারে উভয় দেশ একমত হয়।[১] ওই সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়: কেবল মসুর ডাল, কেরোসিন তেল চিনি, দেশলাই, কাপড়, ওষুধপত্র এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মূল ভূখণ্ড থেকে ছিটমহলগুলোতে পাঠানো যাবে অর্থাৎ ছিটগুলোতে পণ্য সামগ্রী আমদানি করা যাবে। কিন্তু ছিটমহলে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিশেষ করে পাট, ধান, ও তামাক মূল ভূখণ্ড রপ্তানি করা যাবে না।[২]

এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ছিটমহলকে সংকটমুক্ত করার লক্ষ্যে মূল ভূখণ্ড থেকে কিছু পণ্য ছিটমহলে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলেও ছিটমহলে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী মূল ভূখণ্ডে পাঠানোর অনুমতি না দিয়ে তাদের একপ্রকার অর্থনৈতিক চরম দুর্দশার মধ্যেই রাখা হয়। কারণ ছিটমহলের অধিবাসীদের স্বাগতিক দেশের হাট বাজারগুলোতে কেনাবেচা করার কোন অধিকার ছিল না। উল্লেখ্য যে পরবর্তী সময়ে মূল ভূখণ্ড থেকে ছিটমহলগুলিতে পণ্য সামগ্রী পাঠানোর সিদ্ধান্তটিও কার্যকর হয়নি।[৩] ১৯৫০ সালের সেই চুক্তিতে প্রয়োজনে উভয় দেশের জেলা কর্মকর্তা এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের ছিটমহলে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে তার জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে স্বাগতিক দেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পরিদর্শনের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করার বিধান রাখা হয়। কিন্তু ছিটমহলের মানুষ কিভাবে মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত করবে তার জন্য কি নিয়ম শৃঙ্খলা সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি এই চুক্তিতে। ছিটমহলে অবরুদ্ধ মানুষের জন্য তাদের নিজ দেশে যাওয়া আসার ব্যবস্থা করার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যক্তিরা ছিটমহল পরিদর্শন ও রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছে। তাই ছিটমহলের মানুষের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াতের বিষয়টি তাদের আলোচনায় ঠাঁয় পায়নি এবং বাধ্য হয়ে ছিটমহলের মানুষ রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে সীমানা পেরিয়ে মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত শুরু করেছিল। এর কারণ হলো এক কেজি চাল বা আধা কেজি লবণ কিংবা সামান্য কিছু ঔষধের জন্য মূল ভূখণ্ডে অবৈধ অনুপ্রবেশ ছাড়া তাদের কাছে আর কোন বিকল্প ছিল না। এইভাবে জীবনের তাগিদে সীমানায় পারাপার করতে গিয়ে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তাদের নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বছরের পর বছর।

ভারতে আগত ছিটমহলবাসীদের অস্থায়ী শিবিরের পরিস্থিতি:

অস্থায়ী শিবিরের চলচ্চিত্র ব্যাখ্যা করার আগে একটা বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন সেটি হল কেন বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটমহল থেকে এত কম সংখ্যায় মানুষ মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসলো। এ বিষয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ না করার পিছনে কুচলীবাড়ি সংগ্রাম কমিটির মত কোন কোন সংগঠন বাংলাদেশের ছিটমহলে সংখ্যালঘুদের ওপর ক্ষমতাশীল সরকারের রাজনৈতিক চাপের অভিযোগ তুলেছে। তাই প্রথম পর্যায়ে সমীক্ষায় ১১১৭ জন ছিটমহলবাসী ভারতে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলও সেই সংখ্যাটা কমে আসে।[৪] এ বিষয়ে কোচবিহারের সাংসদ রেনোকা সিনহা বলেন, এদেশে আসতে ইচ্ছুক ভারতীয় ছিটের বাসিন্দারা জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা জানাতে চেয়েছিলেন। বাসিন্দারদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে তারা ওখানে জমিজমা বিক্রি করতে পারছেন না। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, যেহেতু এরা ভারতে আসার জন্য তাদের নাম লিখেছেন সে কারণে ওদের জমি কেউ কিনতে চাইছেন না। ওরা ধরেই নিয়েছে এদেরকে ভারতে যেতেই হবে। সুতরাং জমিজমা এমনি পড়ে থাকবে এমন কি এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারও কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।[৫] তবে এদেশে আসা ছিটমহলের কারো কারো দাবি ছিল, বহু মানুষ রয়েছে যারা ভারতে আসতে চায় কিন্তু নানা ধরনের হুমকির জেরে নাম নথিভুক্ত সংক্রান্ত শিবিরে আসতে পারেনি। তবে লালমনিরহাটের জেলাশাসক হাবিবুর রহমান জানায়, ভারতীয় ছিটমহলগুলোতে ভারতীয় নাগরিকদের উপর কোন ধরনের ভীতি প্রদর্শন বা জোর জুলুমের ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশ সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ করে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি জানান বাংলাদেশ থেকে যে ৯৭৯ জন ভারতে চলে আসতে চেয়েছেন তাদের সম্পত্তি বাংলাদেশের প্রশাসনের নজরদারিতেই বিক্রি করতে পারবেন। এমনকি জমি বিক্রিতে ন্যায্য দাম তারা যাতে হাতে পায় তার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জমির মূল্য নির্ধারণে প্রশাসনিক স্তরে আধিকারীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

যদিও ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে এর বিপরীত তথ্য উঠে এসেছে। হাতীবান্ধা থানার অন্তর্গত ১৩৬ নং গোতামারি ছিট থেকে আগত মেখলিগঞ্জ ক্যাম্পের বাসিন্দার বৃদ্ধ বিমল চন্দ্র বর্মন জানান, ছিট বিনিময় হয়ে গেল এমনকি সরকার থেকে মাইকিং করলো যে ছিটের জমি বিক্রি করা যাইবে না। ছিটের জমি ছাড়ি যাইতে হইবে ওপারে যাইয়া সরকার জমি দেবে। জাগা জমিন ঘরবাড়ি সবকিছু দিবে মাইকিং করে দিল বাংলাদেশ থাকিয়া। এখনে আইসবার ২০ দিন আগত ফির কইল জমি বেচা যাইবে। এই ২০ দিনকার মাথায় আমরা ওঠে ১৮-২০ ঘর আছি, ১৮-২০ ঘর জমি বেচাইলে কায় নিবে। একসাথে এত জমি কাও নিবে? তাই ওমরা জমির দাম মনে করেন যে যদি চার লাখ হয় তাহলে দেড় লাখ কয়। ওমরা কয় দেড় লাখকত দিবেন তো দাও। আমরা চিন্তা

করছি এক লাখ পাইলেও আমার লাভ যেটা আসবে সেটাই লাভ। এইভাবে বাংলাদেশে আমরা জমি বেচাইয়া আচ্চি। কাহো কাহ তো বেচাবাড়ি পারে নাই তাও আমরা ভারত যামু।[৬]
প্রাথমিকভাবে একটি অস্থায়ী শিবিরে বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নে একটি সারণিতে পরিসংখ্যানটি বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।[৭]

আস্থায়ী ক্যাম্পের নাম	**যে ছিট থেকে আগত**	**মোট পরিবার সংখ্যা**	**মোট ছিট বাসি**	**হিন্দু ও মুসলিম পারিবার সংখ্যা**
দিনহাটা এনক্লেভ ক্যাম্প।	ছোট গাড়লঝোরা, কালমাটি, দীঘলটারি, দাসিয়ার ছড়া।	৫৮টি	২২৭ জন	হিন্দু পরিবার-৩০টি। মুসলিম পরিবার-২৮টি।
মেখলিগঞ্জ এনক্লেভ ক্যাম্প।	লোথামারি,খড়খড়িয়া, গোতামারি, হাতীবান্ধা, বাঁশ কাটা, কাজলদিঘী।	৪৭টি	২০৫ জন	হিন্দু পরিবার-৪৫টি, মুসলিম পরিবার– ২টি।
হলদিবাড়ি এনক্লেভ ক্যাম্প।	দহলা-খাগড়াবাড়ি, বালাপাড়া-খাগড়াবাড়ি নাজিরগঞ্জ , শালবাড়ি।	৯৬টি	৫০৬ জন	হিন্দু পরিবার-৭১টি, মুসলিম পরিবার-২১টি, খ্রিস্টান পরিবার ৪টি।

নবাগত ভারতীয় তথা ছিটমহলের মানুষদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ছিল ভারতীয় প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সদ্য আগত এই ছিটমহলের অস্থায়ী শিবির গুলিতে পরিবার পিছু ৩০ কেজি চাল, ৫ কেজি মুষল ডাল, ৫ কেজি সরিষার তেল, ৫ লিটার কেরোসিন তেল, ১ কেজি গুঁড়ো দুধ, দেড় কেজি লবণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। তবে পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজনের বেশি হলে তাদের বরাদ্দের পরিমাণ বেশি করা হয়।[৮]এছাড়াও আইসিডিএস প্রকল্প অঙ্গনারী কেন্দ্র নির্মাণ শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ সহ স্কুল শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ছাত্রদের জাতিগত শংসাপত্র এবং অস্থায়ী শিবিরগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। মেয়েদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী নির্মাণ করার

পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু অস্থায়ী শিবিরের অবস্থা নিয়ে অনেক ছিটমহলবাসী আক্ষেপ প্রকাশ করে যে সবার জন্য একই টয়লেটের ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর। টিনের তৈরি ঘর গরম কালে যেমন অস্বস্তি কর শীতকালেও তেমন কুয়াশার জল টিনের চাল থেকে পড়ায় তাদের খুবই অসুবিধার মধ্যে থাকতে হয়। মেখলিগঞ্জ অস্থায়ী শিবির একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল।

চিত্র; ১ মেখলিগঞ্জ অস্থায়ী শিবির;

(উৎস)

https://www.thequint.com/news/india/frontier-betrayal-enclave-dwellers-turn-their-backs-on-india.

ভারতে আগত ছিটমহলবাসীদের স্থায়ী শিবিরের পরিস্থিতি;

যাইহোক এর কিছুদিন পরেই তাদের অস্থায়ী শিবির থেকে দিনহাটার পানিশালা, মেখলিগঞ্জ এবং হলদিবাড়ি তিনটি স্থায়ী শিবিরে তাদের স্থানান্তরিত করা হয়। এরমধ্যে দিনহাটা ১০টি ফ্লাটের ব্লক এবং হলদিবাড়িতে ১৩ টি ব্লক এবং মেখলিগঞ্জে ৭ টি ব্লকে এই পরিবারগুলিকে স্থানান্তর করা হয়। নিম্নে চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী ক্যাম্পের চিত্র দেখানো ;

চিত্র;২ চ্যাংড়াবান্ধা ছিটমহলের স্থায়ী শিবিরের চিত্র, উৎস প্রাথমিক (৩১.৮.২০২৩).

ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে জানা যায় পরিবার পিছু চাকরির স্বপ্ন নিয়ে তারা এ দেশে এসেছিল। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে আরও জানা যায় ১০০ দিনের প্রকল্পে জব কার্ড কিছু করে ৬০ থেকে ৬২ দিন কাজ দেওয়া হচ্ছে। তবে আবার কেউ কেউ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে কেরালা, দিল্লি, বোম্বে সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। আবার অনেকে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ, টোটোরিকশা চালানো, কৃষি শ্রমিকের পেশায় যুক্ত হয়েছে। মেখলিগঞ্জ ক্যাম্পে ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় অশ্বিনী রায় নামে এক ব্যক্তিকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ফ্ল্যাট নিয়ে তাদের কোন সমস্যা আছে কিনা তখন বাঁশকাটা ছিট থেকে আগত এক ব্যক্তি জানায়, ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকির না মনায়। আমরা ফ্যাট একবারও চাই নাই, মাটির উপরাত ছিমসাম বাড়ি চাচি। অ্যাকানা চাষের জমি চাচি। ফ্ল্যাট তো সারা জীবন থাইকপে না, আমার ছাওয়া-পোয়া তখন কোটে যাইবে?[৯]চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী শিবিরে ৩৮ বছর বয়সি স্বপ্না রানী বর্মনকে বর্তমান সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,বাংলাদেশ থেকে মাধ্যমিক পাশ করে এসে এদিকে কোন সুবিধাই পাই নাই। তবে একবার মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট বিডিও অফিসে জমা নিছিলো । কিন্তু আজ ৫-৭ বছর হইয়া গেল জমা নেওয়ার পর এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই করলো না। সরকারি সুযোগ-সবিধাও তেমন পাই না। আশেপাশে কোথাও অঙ্গনারী কেন্দ্র নেই যে কারণে আমার দুই জমজ বাচ্চাকে শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠাতে পারি না। তাই অঙ্গনারী কেন্দ্রের যে পুষ্টিযুক্ত খাবার তাও বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে পারি না।[১০]ছিটমহলের এরকম

স্থায়ী দুটি ক্যাম্প চ্যাংড়াবান্ধা ও হলদিবাড়ি মানুষের অভাব অভিযোগ নিম্মে ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তুলে ধরছি।

সদানন্দ বর্মন বয়স ৭৮ তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তিনি সরকারি ভাতা বা স্বাস্থ্যের চিকিৎসার জন্য কতটা সুযোগ সুবিধা পান তার উত্তরে তিনি বলেন, সরকারি সুযোগ-সুবিধা তেমন পাই না। বয়স্ক ভাতা হয়েছিল তিন-চার মাস ভাতা পাইছিলাম পরে আর পাইনা। গত সাত-আট মাস থেকে ভাতা বন্ধ হয়ে আছে মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ হয় এত দূরে হাসপাতাল থাকার কারণে যাতায়াতে খুবই সমস্যা হয়।[১১] সুবর্ণা বর্মন জানায়, আমি বর্তমানে স্নাতক উত্তর স্তরে বাংলা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছি। আমাকে মাঝে মাঝেই আমাদের ক্যাম্পের আশে পাশের মানুষের থেকে নানা ধরনের তিরস্কার শুনতে হয় কারণ তারা বলে ছিটমহলের মানুষের চাকরি-বাকরি হবেনা পড়াশোনা করে মা-বাবার টাকা পয়সা ধ্বংস করছিস শুধু। তাই আমার সরকারের কাছে নিবেদন যদি আমাদের প্রতি একটু নজর দিত তাহলে হয়তো শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরিখে আমাদের ভবিষ্যৎ পথ তৈরি করা অনেক সহজ হত।[১২]

এই ক্যাম্প টুম্পা বর্মন নামে বয়স ২৩ এর এক মহিলার কাছে সমস্যার কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমাদের ক্যাম্পে কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নাই। স্বামী বাইরে যায় দিনমজুরের কাজে। যদি ক্যাম্পের ভেতর কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকত তাহলে নিজেও কিছু উপার্জন করতে পারতাম। তাতে দুই জনের উপার্জনের পয়সা সংসারের এত অভাব থাকত না। দিপু বর্মন নামে বছর বাইশের বি. এ. তৃতীয় বর্ষে অধ্যানরত ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, ছিটমহল বাসি হিসাবে আমরা কোন অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পাই না। এদেশের মানুষের মতোই আমাদেরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। তাহলে এদেশে আসার আগে সরকার থেকে যে এত কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছিল সেগুলো কেন দেওয়া হচ্ছেনা। আমরা যে এতদিন কষ্ট করে বাংলাদেশ ছিটমহলে ছিলাম তাহলে এর প্রতিদান কি সরকার আমাদের দেবে না? এখানে আসার আগে সরকার থেকে তো বলা হয়েছিল যে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে আমাদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে সরকারের পক্ষ থেকে। এখন দেখছি সেই প্রতিশ্রুতি সবই ভুয়ো তার কিছুই পাচ্ছিনা।[১৩]

এই ক্যাম্পে রিপন বর্মন বয়স ২৭ নামে এক যুবক আক্ষেপ করে বলেন নতুন দেশে এসে বড় অভাবে পড়ে গেছি। এই অভাবকে তোয়াক্কা না করে টোটো কিনে টোটো রিক্সা চালানোর পাশাপাশি

নিজের পড়াশোনা চালিয়ে বিএ পাস করেছি। বি.এ কমপ্লিট করলাম কিন্তু চাকরি-বাকরির তো কোন নাম নেই। তাই ভাবছি এইখানে বেকার অবস্থায় না থেকে অন্য রাজ্যে বা অন্য দেশে চলে যাব শ্রমিকের কাজ করতে তাতে হয়তো পরিবারের অভাব মেটাতে পারবো।[১৪]

চ্যাংড়াবান্ধা ক্যাম্পের নীলা রানী বর্মনকে বর্তমানের কোনো সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, আমাদের ক্যাম্পে পানীয় জলের খুবই অভাব যে জল আমাদের ট্যাংক থেকে সরবরাহ করা হয় তা খুবই আয়রনযুক্ত পরিশোধনের কোন ব্যবস্থা নেই এর পাশাপাশি তিনি আরো বলেন যে হলদিবাড়ি ক্যাম্পের কথা শুনেছি সেখানে নাকি বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা আছে। তিনি আরো বলেন যে আমাদের যেখান এনে ক্যাম্প করে দিছে এখান থেকে যাতায়াতের সুবিধা নেই হাটবাজার অনেক দূরে স্কুল কলেজেও অনেক দূরে। এই নিয়ে আমরা অনশন করেছি যে আমরা এই জায়গায় আসবো না। কিন্তু পরে ডি.এম হামাক প্রতিশ্রুতি দিছে এই ব্রিজটা করিয়া দিবে। ব্রিজের কাজ চলছে ব্রিজ চালু হয়ে গেলে আমাদের যাতায়াতের আর কোন সমস্যা থাকবে না।[১৫]

উপরিক্ত চ্যাংড়াবান্ধা ভোটবাড়ি ক্যাম্পের সাক্ষাৎকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এর মধ্য দিয়ে এটা বোঝা গেল যে সেখানে মানুষের যাতায়াত কর্মসংস্থান এর অভাব রয়েছে। এই ক্যাম্পে প্রায় সবাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ শুধুমাত্র দুজন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এই ক্যাম্পে এসেছিল। একজন ক্যাম্পে বসবাসকালেই মারা যান আরেকজন ক্যাম্প ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। এই তথ্যটি ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে উঠে আসে। এখানে চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী ক্যাম্পের শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশ এবং নারী-পুরুষের শতকরা হার নীচে একটি সরণির মাধ্যমে দেখানো হল।

পেশা	সাক্ষাৎকারের সংখ্যা	শতকরা হার
১, কৃষক	৬	২৬.০৮%
২, শ্রমিক	৭	৩০.৪৩%
৩, ছাত্র-ছাত্রী	৩	১৩.০৪%
৪, গৃহিণী	২	৮.৬৯%
৫, চাকুরীজীবী	০	০০%
৬, বেকার	৫	২১.৭৩ %
মোট, ৬	যোগফল; ২৩	১০০ শতাংশ

চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী ক্যাম্পের শতকরা ভাগাহার : উৎস প্রাথমিক (২০২৩)

এবারে হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের মানুষজনের অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং এর মাধ্যমে এই ক্যাম্পে বসবাসকারী মানুষের জীবন জীবিকা তুলে ধরবো। কিন্তু তার আগে এই ক্যাম্প এর শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশা এবং নারী-পুরুষের শতকরা হার নীচে একটি সরণির মাধ্যমে দেখানো হল।

পেশা	সাক্ষাৎকারের সংখ্যা	শতকরা হার
১, কৃষক	৩	১২.৫%
২, শ্রমিক	৭	২৯.১৬%
৩, ছাত্র-ছাত্রী	৫	২০.৮৩%
৪, গৃহিণী	৪	১৬.৬৬%
৫, চাকুরীজীবী	১	৪.১৬%
৬, বেকার	২	৮.৩৩%
মোট, ৬	২২	১০০ শতাংশ

হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের শতকরা ভাগাহার। উৎসব প্রাথমিক (২০২৩)

চিত্র; ৩, হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের প্রবেশদ্বার। উৎসব প্রাথমিক (২০২৩)

চিত্র ; ৪, হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের চিত্র । উৎসব প্রাথমিক (২০২৩)

হলদিবাড়ি ক্যাম্পে বসবাসকারী মানিক রায় নামে এক ব্যক্তিকে তাদের বর্তমান সমস্যা নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমাদের তো সরকার থেকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি সরকার পূরণ করেনি। যেমন আমরা শুনেছিলাম সরকার থেকে আমাদের হাতে ৫ লাখ করে টাকা তুলে দেবে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু পুনর্বাসন বলতে আমাদের শুধু একটা ফ্লাট বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে আমরা বসবাস করছি। এটা ভালো কিন্তু আমরা যখন বাংলাদেশে পঞ্চগড় জেলায় ছিলাম তখন আমাদের এই ক্যাম্পের বেশিরভাগ ৯০% এর উপরে মানুষের জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। কিন্তু এখানে আসার পরে সরকার থেকে তো আমাদের কোন জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি তাই বাধ্য হয়ে আমাদের অন্য পেশায় যুক্ত হতে হচ্ছে। আমরা যেহেতু বেশি পড়াশোনা করিনি তাই মুটে মজুরের কাজ বা আমাদের ক্যাম্পের বেশিরভাগ যুবকেরা টোটো চালানোকে তাদের জীবিকা করে নিয়েছে। কিন্তু যারা একটু বেশি বয়স্ক তারা তো কৃষিকাজ ছাড়া আর কোন কাজই করতে পারে না তাই তারা বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে। আর সরকার থেকে তো আমাদের আগে অস্থায়ী ক্যাম্পে যেভাবে চাল ডাল দিত সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। তার ফলে অনেক পরিবারই খুব অভাব কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছে। তিনি আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা এই সাক্ষাৎকারে বলেছেন সেটি হল ছিটমহলে বসবাসকারী যুবকদের বৈবাহিক ক্ষেত্রে খুবই সমস্যা। কারণ ছিটমহলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষেরা তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে অস্বীকার করছে। তাই ৩০ থেকে ৩৫ জন যুবক এখানে আছে যাদের বয়স ৩৫ থেকে

৪০ তারা এখনো বিয়ে করতে পারছে না। কারণ হঠাৎ করে এখানে এসে একটা স্থায়ী কাজ পাওয়া তো সহজ নয় যার জন্য আমাদের এই কষ্ট।[১৬]

এ প্রসঙ্গে ছিটমহলে বসবাসকারী বয়স ৪৫ এর জ্যোতিষ রায় পেশায় দোকানদার ছিটমহলে স্থায়ী ক্যাম্পের যুবকদের বিবাহ না হওয়া বা বেকার হয়ে পড়ার পিছনে যে কারণগুলি বলেছেন সেগুলি হল, ধরেন যে যারা বাংলাদেশে এসএসসি পাস করেছে তারা এ দেশে আসার পর তাদের সার্টিফিকেট গুলির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই পড়াশোনা করে হঠাৎ করে এদেশে আসার পরে কি কাজ করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে তারা টোটো চালানো বা শ্রমিক বা দিনমজুরের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকে এই ছিটমহলের পাশাপাশি অন্য ভালো জীবিকা না থাকার কারণে বেকার অবস্থায় ঘরে বসে রয়েছে। এমনকি তিনি এও বলেন যে বাংলাদেশে বসবাসকালে দুজন ব্যক্তি রয়েছে যারা সে দেশে চাকরি ছেড়ে এসেছে তারাও বেকার হয়ে বসে আছে কারণ একটাই বাংলাদেশের নির্ধারিত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের এই দেশে গ্রহণযোগ্যতা নেই। [১৭]

হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের জ্যোতিষ চন্দ্র রায় নামে বয়স ৬০ এর এক বৃদ্ধ তার জীবনের এক যন্ত্রণাময় ঘটনা আক্ষেপ করে বলেছেন। তিনি বলেন, আগে যখন ছিট এ ছিলাম সেখানে নানা দৈনন্দিন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছি। ছিটমহল বিনিময় এর সময়ও আমাদের যন্ত্রণা কমেনি কারণ সে সময় আমরা যখন সেদেশে জায়গা জমি বিক্রি করে আসি তার সঠিক মূল্য পাইনি। যখন জায়গা জমি নানাভাবে বিক্রি করে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন আমার তিন ছেলে এক মেয়ে সহ পাঁচ জনের নাম ২০১১ সালের জনগণায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আমার মা তার মেয়ের বাড়িতে ঘুরতে যাওয়ায় নাম তালিকাভূক্ত করতে পারিনি। তাই যখন ২০১৫ সালে স্থল সীমা চুক্তির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হলো তখন দেখি আমার পরিবারের সবার নাম আছে কিন্তু আমার মায়ের নাম নেই। তখন আমি বিভিন্ন ছিটমহল ক্যাম্পের অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করলেও কোনোভাবেই আমার মায়ের নাম সে তালিকায় তুলতে পারিনি। যখন ছিটমহল বিনিময় হয়ে পাকাপাকিভাবে আমরা এ দেশে আসার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি তখন নিয়ম অনুযায়ী তারা আমার মাকে এদেশে আসার অনুমতি দেয়নি। আমার মায়ের বয়স ৮০ বছরের কাছাকাছি এই বৃদ্ধ মাকে আমি কার কাছে রেখে যাবো এ নিয়ে আমার যেন চিন্তার শেষ ছিল না। বর্ডারে বিএসএফদের হাতে পায়ে ধরেও আমার মা'কে এ দেশে আনতে পারিনি। এমনকি সরকারের বিভিন্ন অফিসারেরা বলেছেন যে তোমার পরিবারের সবার নাম আছে এনার নাম নেই মানে এ

তোমার মা নয় তুমি মিথ্যা বলছো। তখন নিরুপায় হয়ে আমি অন্য উপায়ে মাকে এদেশে এনেছি আনতে বাধ্য হয়েছি।[১৮]

এই যন্ত্রণা যেন জ্যোতিষ রায়ের জীবনকে বিষন্ন করে তুলেছে। ছিটমহল বিনিময়ের আগে ছিটে বসবাসকারী সকল মানুষজনের একটাই আক্ষেপ ছিল যে তারা কোনদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। তাই কোন দেশের নাগরিক হয়ে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং ভোটাধিকার দ্বারা প্রয়োগ করবে এই আশাতেই বুক বেঁধেছে এবং বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। এত আশা বুকে নিয়ে যখন তারা নাগরিকত্ব পেল তার মধ্যে সুন্দরী রায় (জ্যোতিষ চন্দ্র রায়ের মা) নামে এই বৃদ্ধা মহিলা যখন নাগরিকত্বই পেল না সুতারাং তার একটা সারা জীবনের অতৃপ্ত ইচ্ছা থেকেই গেল। নিম্নে জ্যোতিষ চন্দ্র রায়ের ট্রাভেল ভিসা ও পরিচয় পত্রের ছবি দেওয়া হল।

अस्थायी यात्रा - सह - पहचान पास

[भारत - बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता १९७४ और इसके प्रोटोकाल २०११ के अनुसरण में पट्टियों के आदान -प्रदान के अनुसार जारी किये गए]

TEMPORARY TRAVEL-CUM-IDENTITY PASS

[Issued in pursuance of exchange of enclaves as provided in the India- Bangladesh Land Boundary Agreement, 1974 and its 2011 Protocol.]

অস্থায়ী ভ্রমণ ও পরিচয়পত্র

[১৯৭৪ সালের ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমানা চুক্তি এবং ২০১১ সালের প্রটোকল অনুযায়ী ছিটমহল হস্তান্তর বিষয়ে প্রকাশিত]

सत्यमेव जयते

भारत का उच्चायोग
ढाका

HIGH COMMISSION OF INDIA
DHAKA

ভারতীয় হাই কমিশন
ঢাকা

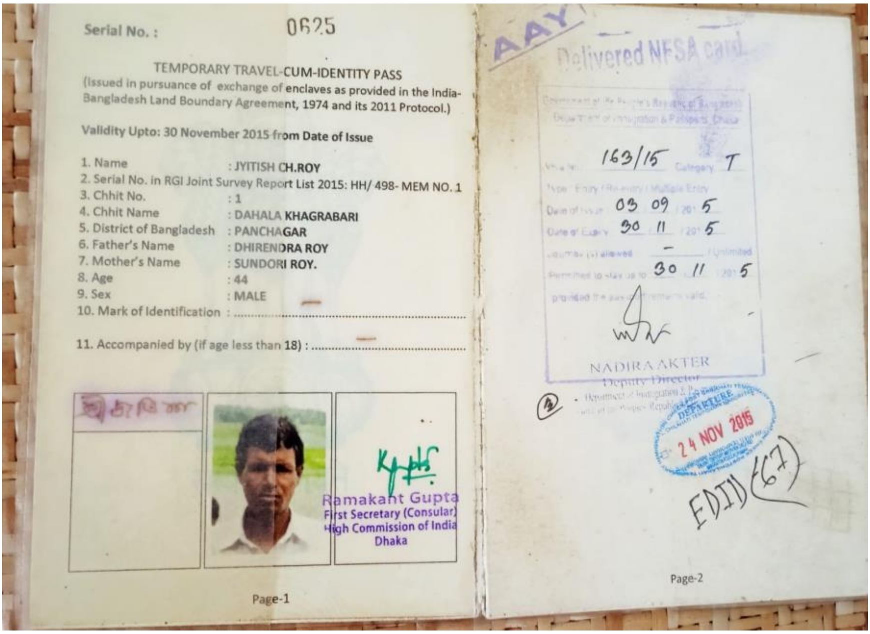

Serial No. : 0625

TEMPORARY TRAVEL-CUM-IDENTITY PASS

(Issued in pursuance of exchange of enclaves as provided in the India-Bangladesh Land Boundary Agreement, 1974 and its 2011 Protocol.)

Validity Upto: 30 November 2015 from Date of Issue

1. Name : JYITISH CH.ROY
2. Serial No. in RGI Joint Survey Report List 2015: HH/ 498- MEM NO. 1
3. Chhit No. : 1
4. Chhit Name : DAHALA KHAGRABARI
5. District of Bangladesh : PANCHAGAR
6. Father's Name : DHIRENDRA ROY
7. Mother's Name : SUNDORI ROY.
8. Age : 44
9. Sex : MALE
10. Mark of Identification : ......
11. Accompanied by (if age less than 18) : ......

Ramakant Gupta
First Secretary (Consular)
High Commission of India
Dhaka

Page-1

Delivered NFSA card

NADIRA AKTER
Deputy Director

DEPARTURE
24 NOV 2015

Page-2

চিত্র; ৫, জ্যোতিষ চন্দ্র রায়ের ট্রাভেল ভিসা ও পরিচয় পত্রের ছবি।

উৎস প্রাথমিক (২০২৩)

তিনি আরো বলেন আমার মায়ের নাম যেমন ২০১১ সালে জনগণনা নিয়েই তেমনি অনেক মানুষ আছে যারা ২০১১ সালে গণনার সময় ছিল না। অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে বা কাজ করতে বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। আমাদের ছিটমহলে অনেক মানুষ আসতো অভাব অভিযোগ লিখে নিয়ে যেত কিন্তু কোনদিন সমস্যার সমাধান হতো না। তাই ছিটমহলের মানুষের একটা ধারণা ছিল যে এগুলো তথ্য নিয়ে যাওয়া সবই লোক দেখানো নিয়ে যাওয়া এবং ভুয়ো। সেরকমই ২০১১ সালের জনগণনা ও তারা অনেকেই গুরুত্বহীন মনে করে অনিহা প্রকাশ করে এবং এই তালিকায় নাম নথিভুক্ত ইচ্ছে করেই করেনি। সরকারের তরফ থেকে যদি ঘোষণা করে দেওয়া হতো যে ২০১১ সালে জনগণনা সরকারের পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে করা হচ্ছে তাহলে অনেকেই এদেশে আসার জন্য নাম লেখাতো।

উপরিক্ত এই ক্ষেত্রসমীক্ষা পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বাংলাদেশ সরকার কোনভাবেই চাইতো না যে বেশি সংখ্যায় মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আসুক। কারণ যেহেতু ভারত থেকে বাংলাদেশী ছিটের কোন মানুষ বাংলাদেশের তাদের মূল ভূখণ্ডে ফিরে যাচ্ছে না তাই আন্তর্জাতিক মহলে যাতে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট না হয় সেই দিকের কথা মাথায় রেখেই ২০১১ সালের জরিপ সমীক্ষা সঠিকভাবে করা হয়নি। এই সমীক্ষার জন্য যে সরকারের পক্ষ থেকে মাইকিং করার কথা ছিল

সেটাও করা হয়নি। আসলে এর কারণ একটাই যদি বেশি পরিমাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশ থেকে এদেশে চলে আসে তাহলে বাংলাদেশ সরকার হিন্দু নির্যাতনের মত এক সাম্প্রদায়িক প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে পড়তে পারে। তাই স্থলসীমা চুক্তি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকার ছিটমহলে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ শুরু করে এবং তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা বেশি পরিমাণে দিতে থাকে যাতে সেই মানুষগুলো বাংলাদেশের ঐ ভূখন্ডেই তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে।

এছাড়াও তিনি বর্তমান সময়ের সমস্যা সাপেক্ষে বলেন বিনিময়কালীন যে সমস্ত কাগজপত্র আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা সংশোধন করার কোন ব্যবস্থা সরকার রাখেনি। যেমন অনেকের পরিবারের একজন দুজন সদস্যর নাম বাদ পড়ার পাশাপাশি এদেশে ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ডের সংশোধনের ক্ষেত্রেও কোন সঠিক পদ্ধতি তৈরি করা হয়নি। যেমন আমার এক ছেলে রেশন কার্ডের সমস্যা রয়েছে যার জন্য সেই রেশন কার্ডের রেশন এখনো পর্যন্ত আমি তুলতে পারি না এ নিয়ে বিডিও অফিস, ডি এম অফিস বা ভূমি অফিসে গিয়েও এর কোন সুরাহা করতে পারিনি। জানিনা এই সমস্ত সমস্যাগুলো আদৌ সরকারের পক্ষ থেকে সমাধান করা হবে কিনা।

এই ক্যাম্পেরই মিনতি বর্মন নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন যে, আমরা যখন এখানে এলাম তখন দিনরাত সাংবাদিক ঘোরাঘুরি করত আমাদের সমস্যার কথা শুনতো তা পত্র পত্রিকা লেখালেখি করত। কিন্তু তার কিছুদিন পর থেকেই এখানে আমাদের সমস্যার কথা শোনার জন্য কেউ আসে না। আমাদের যে এই বিল্ডিং বাড়িগুলো দিয়েছে সেখানে আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে একই বিল্ডিং এ এত মানুষ থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও এই বিল্ডিংয়ে বসবাস করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সেরকম ভালো কাজেরও সুযোগ নেই যে আমরা কাজ করে রুজি রোজগার বা জীবন অতিবাহিত করব। সরকারের পক্ষ থেকে যে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয় এটাই কি তাহলে পুনর্বাসন? আমাদের বাড়ির বাইরে কোন জায়গা জমিও নেই যে আমাদের পরিবারের সদসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেখানে ঘরবাড়ি করে থাকবো। তিনি বলেন মানুষের বাড়িতে কাজ করলে প্রতিদিন কাজ পাওয়া যায় না যদি সরকার কোন একটা স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দিত তাহলে হয়তো পরিবার নিয়ে অন্তত খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারতাম।[১৯]

এই ক্যাম্পের কমলেশ্বর বর্মন নামে এক ব্যক্তির অভিযোগ যে, তারা ১৩ টি পরিবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার জন্য নাম নথিভুক্ত করে। কিন্তু যখন ছিটমহলের চূড়ান্ত তালিকায় প্রকাশ করা হয় যে কারা কার বাংলাদেশ থেকে মূল ভূখণ্ড অর্থাৎ ভারতে আসবে তখন দেখা যায় যে এই কমলেশ্বর রায়ের ১৩ টি পরিবারের মধ্যে মাত্র তিনটি পরিবারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে বাকি

১০ টি পরিবারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় নেই। তখন তিনি ছিটমহল অফিসে যোগাযোগ করলেও কোন সূরাহা মেলেনি। এমনকি এই কমলেশ্বর রায় হলদিবাড়ি ক্যাম্পে থেকে ডিএম অফিস বিডিও অফিসে অভিযোগ করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর অফিসেও বিষয়টি নিয়ে চিঠি লিখেছেন কিন্তু কেউই আর এই ছিটমহলের সমস্যা নিয়ে অতটা কর্ণপাত করে না বলে তার অভিযোগ।[২০]যাই হোক এ সমস্ত সমস্যা সত্বেও ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের দীর্ঘ আটষট্টি বছর না নাগরিক থেকে তারা কোন একটি দেশে নাগরিক হতে পেরেছে এবং তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে এটাই একদিক থেকে ছিটমহল বিনিময়ের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলা যেতে পারে।

পরিচিতি সঙ্কটের নতুন অধ্যায়:

অবশেষে, যে ৯৭৯ জন মানুষ ভারতবর্ষে ফিরে এসেছে তাদের তিনটি স্থায়ী ক্যাম্পে পুনর্বাসন দেওয়ার ফলে ছিটমহলের তকমাটি তাদের জীবন থেকে মুছে যায়নি। কারণ তাদের যে পুনর্বাসন হিসাবে ফ্ল্যাট বাড়ি দেওয়া হয়েছে সেগুলো থেকে সহজেই তাদের চিহ্নিত করা যায় যে তারা ছিটমোহলের মানুষ। তাই ছিটমহলের বিলুপ্তি ঘটলেও তাদের থেকে ছিটমহলের তকমাটি এখনো মুছে যায়নি। এই স্থায়ী ক্যাম্পগুলোর মানুষের দাবি হলো এই যে যদি ভারত সরকার তাদের ফ্ল্যাট দেওয়ার পরিবর্তে গ্রামে আর পাঁচটা বাড়ির মত সাধারণ বাড়ি বানিয়ে দিত তাহলে হয়তো তারা ভারতীয় সমাজের মূল স্রোতে সহজেই মিশে যেতে পারত।

বাংলাদেশের ছিটমহলে থাকাকালী তারা যে বাংলাদেশে এসএসসি পাস করেছে সেই শিক্ষা সনদগুলি বা সার্টিফিকেটগুলি এদেশের মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং তার পরিবর্তে সরকার তাদের শিক্ষার মূল্যায়ন করে ভারতীয় কোন ভারতীয় শংসাপত্র প্রদান করত তাহলে হয়তো তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা থাকত না। এই অবস্থায় তারা বাধ্য হয়ে দিনমজুর বা টোটো চালানোর মতো কাজ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে বেকারত্বের নিরিখে পছন্দ সই কাজ তারা পাচ্ছে না। এছাড়া নবাগত ছিটমহলের মানুষদের সহজেই কেউ ভালো কাজে নিযুক্ত করতে চাইছে না। ছিটমহলে থাকাকালীন বেশিরভাগ মানুষ কৃষি কাজের সাথে যুক্ত ছিল বলে এদেশে এসে তারা সহজেই অন্য পেশায় যুক্ত হতে পারছে না। দিনমজুরের কাজ করলেও অনেক সময় তাদের কাজ না থাকার কারণে বেকার হয়ে বসে থাকতে হয়। এর জন্য কিছু কিছু পরিবার অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে। যেহেতু তারা দীর্ঘ দিন কোন রাষ্ট্রীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছে তাই সরকারের পক্ষ থেকে যদি তাদের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হতো তাহলে হয়তো তাদের দুঃখ কিছুটা লাঘব হত।

পরিশেষে এই কথাটি বলা যায় যে ভারতবর্ষে যেমন জাতিগত বিচারের নিরিখে সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে রেখেছে ঠিক সেরকম ছিটমহলবাসীদের আলাদা

স্থায়ী শিবিরে রাখার মধ্য দিয়ে তাদেরও ছিটমহলবাসি হিসেবে ভারতীয়দের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে এটা সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের উপর থেকে এই ছিটমহলের তকমাটি বিলুপ্ত হলেও নতুন করে তাদের কিন্তু ছিটমহলের মানুষই বলা হচ্ছে। ছিটমহলের স্থায়ী ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ তাদের ছিটমহলবাসী হিসেবেই জানবে যতদিন পর্যন্ত তারা ওই ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের মতো ঘরবাড়ি করে বসবাস শুরু করবে।

গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য;

- ইউনুছ,এ, এস, এম, *কাঁটাতারে অবরুদ্ধ ছিটমহল,* অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৩।
- গোলাম রব্বানী, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল,* অবরুদ্ধ ৬৮ বছর। প্রথমা প্রকাশন, সেপ্টেম্বর, ২০২২।
- চাকী, দেবব্রত, *ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত* , প্রসঙ্গ: ভারত -বাংলাদেশ ছিটমহল। সোপান প্রকাশন ২০১১।
- বিশ্বাস, রাজর্ষি, (সম্পাদিত *বেরুবাড়ি তিনবিঘা ছিটমহল*), ইতিহাস জনজীবন সংস্কৃতি। গাঙচিল,ডিসেম্বর, ২০১৮।
- হোসেন, লতিফ, *ইবলিশনামা,* অভিযান পাবলিশার্স ,কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২০।
- কবির, শাহরিয়ার, *বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন এবং বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক* (একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি), ঢাকা, ১২১২ বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০২২।
- চাকি, দেবব্রত, 'ছিটমহলের ছেড়া কথা', (ধারাবাহিক কলাম,) প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে (সম্পাদিত) এখন ডুয়ার্স, কলকাতা, জুলাই, ২০১৫।
- বিশ্বাস, রাজর্ষি, (সম্পাদিত), *দেশভাগের লাভ-ক্ষতি বাংলার উত্তরাঞ্চল,* গাংচিল, কলকাতা প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০২৩।
- রায়, হিমিমিত্র, 'এপার ওপার মিলিয়ে' (প্রবন্ধ) রাজর্ষি বিশ্বাস (সম্পাদিত) *বেরুবারি তিনবিঘা ছিটমহল ইতিহাস জনজীবন সংস্কৃতি,* গাংচিল ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০১৮।

ইংরেজি গন্থপঞ্জি ও নিবন্ধ সমূহ;

- Barman, Rup Kumar. The *Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh, A Historical Study.* Abhijeet Publications, 2019.
- Schendel, Willem Van. *'Stateless in South Asia: The Making of India Bangladesh Enclaves'* the journal of Asian studies 61:1, February 2002.
- Cons, Jason. *History of Belonging (s): Narrating Territory, possession, and Dispossession at the India-Bangladesh Border.* Modern Asian Studies, 46(3), 527-558, 2012.
- Basu, Partha Pratim. *The Indo-Bangla 'Enclaves 'and a Disinherited*

*People. Jadavpur Journal of International Relations.vol.*15, no. 2011.

- Sardar, Sanjib. *History of Enclave Exchange Between India and Bangladesh and the Future Challenges of Rehabilitation.* The journal of oriental research Madras. ISSN: 0022-3301, January 2021.

সূত্র

[১] *বাংলাদেশ -ভারত ছিটমহল অবরুদ্ধ ৬৮ বছর,* গোলাম রব্বানী, মোহাম্মদ, পৃষ্ঠা , ৮৩।

[২.] Government of East Bengal, department of Home (political) CR 3C2 5/51 (2237 - 2255), March 1953, vol.15, NAB

[৩.] Op.cit. রব্বানী, পৃষ্ঠা, ৮৪।

[৪.] *আনন্দবাজার পত্রিকা* ১৭ই জুলাই, ২০১৫।

[৫.] দেশে ফিরতে চেয়ে বিপাকে ভারতীয় ছিটের বাসিন্দারা *উত্তরবঙ্গ সংবাদ* ১৫ ই সেপ্টেম্বর ২০১৫।

[৬]. মেখলিগঞ্জে অবস্থিত অস্থায়ী শিবিরে বসবাসকারী বিমল চন্দ্র বর্মনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত। ২৯ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩।

[৭.] মোহাম্মদ লতিফ হোসেনের 'আখ্যানে ছিট মহলের উদ্বাস্তু জীবন এবং অস্থায়ী শিবিরের চালচিত্র' গবেষণাধর্মী অধ্যায় থেকে সংগৃহীত।

[৮.] মোহাম্মদ লতিফ হোসেনের 'আখ্যানে ছিটমহলের উদ্বাস্তু জীবন এবং অস্থায়ী শিবিরের চালচিত্র' গবেষণাধর্মী অধ্যায় থেকে সংগৃহীত।

[৯.] মেখলিগঞ্জে অবস্থিত স্থায়ী শিবিরে বসবাসকারি অশ্বিনী রায়ের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত , ৩০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

[১০.] চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী শিবিরের স্বপ্না রানী বর্মনের সাথে সাক্ষাৎকার। ২৯ শে আগস্ট ২০২৩।

[১১]. চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী শিবিরে সদানন্দ বর্মন বয়স ৭৮ এর সাথে সাক্ষাৎকার। ৩০ আগস্ট ২০২৩।

[১২.] সুবর্ণা বর্মন বয়স ২১, চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী শিবিরের বাসিন্দার এর সাথে সাক্ষাৎকার। ৩১ শে আগস্ট ২০২৩।

[১৩.] চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী ক্যাম্পের টুম্পা বর্মন(২৩) এবং দীপু বর্মন (২২) এর সাথে সাক্ষাৎকার। ৩১ শে আগস্ট ২০২৩।

[১৪.] অর্চনা বর্মন (২৩) এবং রিপন বর্মন (২৭), চ্যাংড়াবান্ধা স্থায়ী ক্যাম্পের বাসিন্দারদের সাথে সাক্ষাৎকার। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

[১৫.] নীলা রানী বর্মন (৪০) এর সাথে সাক্ষাৎকার। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

[১৬.] মানিক রয় (৩৮) হলদিবাড়ির স্থায়ী ক্যাম্পের বাসিন্দারের সাথে সাক্ষাৎকার। ২,৯,২০২৩।

[১৭.] জ্যোতিষ রায় বয়স ৪৫, হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের বাসিন্দার। ২০২৩ ।

[১৮]. হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের জ্যোতিষ চন্দ্র রায় নামে বয়স ৬০ এর বাসিন্দারের সাথে সাক্ষাৎকার। ২০২৩।

[১৯.] হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের মিনতি বর্মন এর সাথে সাক্ষাৎকার। ২০২৩।

[২০.] হলদিবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পের কমলেশ্বর বর্মন এর সাথে সাক্ষাৎকার। ২০২৩।